দৈনিক জনকণ্ঠ

72

তারিখ ... 13 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩ .....

হাওর এলাকায় প্রাইমারী শিক্ষকরা স্কুলে যান মাসে দু'চার দিন

মাসুদ কামাল

মনোরঞ্জন বর্মন। কিশোরগঞ্জের মিঠামন থানার ঢাকী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সেদিন ছিল শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি। স্কুলে বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। পাঁচটি ক্লাসের মধ্যে দু'টি মাত্র চলছে। উপস্থিত দু'জন শিক্ষকের একজন মনোরঞ্জন বর্মন, অপরজন তাঁর স্ত্রী। শিক্ষকবিহীন ক্লাসের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা, হৈ চৈ করছে। যে ক্লাস দু'টি চলছে সেখানেও পড়ালেখায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ কতটা আছে বলা মুশকিল। কারণ তাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি বাইরের দিকে। ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষকের দৃষ্টিতেও যেন এক ধরনের নিস্পৃহতা ও ক্লান্তির ছাপ।

এটি কিন্তু ভাটি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর স্বাভাবিক কোন চিত্র নয়। বরং বলা যায়, ব্যতিক্রমী এবং উন্নত চিত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চোখে পড়বে করুণ চিত্র। শিক্ষক নেই, ছাত্র-ছাত্রী নেই, একেবারে খাঁ খাঁ চারদিক। সেদিন থেকে ঢাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যে উন্নত তা টের পাওয়া গেল গ্রামবাসীর কথাবার্তা থেকেই। এ স্কুলের পারফরমেন্সে তারা খুবই সন্তুষ্ট। লিয়াকত আলী নামক একজন জানালেন, বর্মন বাবু ও তাঁর স্ত্রী খুব পরিশ্রম করেন। বৃত্তিও পেয়েছে এখান থেকে। ফরিদ আহমেদ ঢাকী গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তিনিও প্রশংসা করলেন প্রধান শিক্ষকের। তিনি আরও বললেন-তারপরেও দু'জনে কি আর পাঁচজনের কাজ করতে পারে। মিঠামনের অন্য ইউনিয়নগুলোর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষায় ঢাকীই কিছুটা উন্নত। এখানে আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আধা সরকারী কমিউনিটি স্কুল। সেটিতেও শিক্ষক থাকেন মাত্র দু'জন।

ভাটি অঞ্চলের জীবন-৯

পুরো হাওর অঞ্চলেই শিক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্দশা বিদ্যমান। ছাত্ররা স্কুলে আসে না, এ জন্য কোন জবাবদিহি করতে হয় না। জবাব চাইবে কে? শিক্ষক নিজেই তো আসেন না। অনুপস্থিত থাকার জন্য শিক্ষকেরও কোন সমস্যা হয় না, মাসে একদিন গিয়ে খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে আসেন। ছাত্রদের হাজিরা খাতায় দিয়ে আসেন ভুয়া উপস্থিত চিহ্ন। এ সব তদারকির লোক ও নেই। থানা শিক্ষা অফিসের লোকজনেরও তো একই অবস্থা। থানা সদরে আসেন তাঁরা মাসের ২৫ তারিখের পরে। বেতন তুলেই চলে যান আবার শহরে স্ত্রী-সন্তান পরিবারের কাছে। একাধিক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্ষাকালে শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলই বন্ধ থাকে। কেবল নৌকাই হয় তখন যোগাযোগ মাধ্যম। ছোট ছোট শিশুকে নৌকায় করে দূরবর্তী স্কুলে নিয়ে যেতে অনেক অভিভাবকের মধ্যেই দেখা যায় অনীহা। ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতির নগণ্য হারকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে শিক্ষকরা থাকেন নিয়মিত অনুপস্থিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো না হলেও বর্ষায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও উপস্থিতি থাকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ঢাকী গ্রামের নূর হোসেন জানান, বর্ষায় হাই স্কুলে যাতায়াতের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ নৌকার ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন ঘাটে গিয়ে ঘুরে ঘুরে ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করা হয়।

পুরো ভাটি অঞ্চলে নগণ্যসংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে আবার ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। ছেলেরা লেখাপড়ায় একটু ভাল করলেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কোন শহরে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নেই সে সুযোগটি। ঢাকী উচ্চবিদ্যালয়ে সোয়া দু'শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৬৭ জনই মেয়ে। মেয়েদের এই সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও পুরো হাওর অঞ্চলে মেয়েদের জন্য পৃথক কোন স্কুল খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অষ্টগ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষক নির্মল চন্দ্র সাহাও বললেন একই কথা। স্কুলগুলোতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। তাদের জন্য পৃথক স্কুলের দাবি অনেক দিনের। কিন্তু সে দিকে নজর দেয়ার লোক নেই। এ এলাকারই মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আবু বাহার বললেন, নজর দেবে কে? শিক্ষা অফিসে প্রধান কর্মকর্তা তো থাকেনই না। সহকারী পর্যায়ের যাঁরা থাকেন মাঝে মাঝে তাঁদের তো নজর থাকে অন্য দিকে। কিভাবে মাল কামানো যায় সেই ধান্ধা। এ এলাকায় শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের কথাও জানালেন আর একজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি ভয়াবহ। কিশোরগঞ্জের ইটনা থানা হয়েছে আজ প্রায় ৮০ বছরের মতো। অথচ এখনও সেখানে একটি কলেজ গড়ে ওঠেনি। নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে নামে মাত্র একটি কলেজ থাকলেও গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সেখানে একজনও ছাত্রছাত্রী দেখা যায়নি। কলেজের অধ্যক্ষের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—এ রকমই ছাত্রছাত্রী হয়। এখানে যারা ভর্তি হয় তাদের আসলে লক্ষ্য থাকে কেবল নকলের দিকে। লেখাপড়া করে যারা পাশ করতে চায় তারা শহরেই চলে যায়। তিনি আরও বলেন, সরকারী কর্মকর্তারা হাওর এলাকার থানা সদরগুলোতে ছেলেমেয়ে নিয়ে নিয়মিত অবস্থান না করলে এ এলাকায় ভাল স্কুল কলেজ কখনই গড়ে ওঠবে না। তাঁদের ছেলেমেয়েরা থাকলে বাধ্য হয়ে তাঁরাই উদ্যোগ নেবে। ভাল স্কুল-কলেজ হলে স্থানীয় ছেলেরাও আর বাইরে যাবে না।

স্থানীয় গ্রামের ছেলেদের এমনিতে লেখাপড়ার দিকে আগ্রহও বেশ কম বলে জানিয়েছেন একাধিক অভিজ্ঞজন। মিঠামনের রাজনৈতিক নেতা এ্যাডভোকেট ফরিদ আহমেদ বলেন, দারিদ্র্য আর কঠোর বাস্তবতার কারণেই গ্রামের লোকেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে দেয় না।

বর্ষায় যোগাযোগের সমস্যা থাকে। বর্ষার পর শুকনার দিনে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দ করে গোবর কুড়াতে। এক টুকরা গোবর পেলে তা দিয়ে যে চট বা জ্বালানি তৈরি হয় তার দাম ২৫ থেকে ৩০ টাকা। নগদ এ প্রাপ্তি রেখে কে পাঠাবে তার সন্তানকে স্কুলে। আর বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে তো লাগে ফসল কাটার ধুম। তখন দিন মজুরই পাওয়া যায় না। নাবালক ছেলেদেরও তখন মজুরি দৈনিক ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত হয়ে যায়। এভাবে হাওর এলাকার সিংহভাগ মানুষই রয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে দূরে।

OF SHEETS